ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৬ ও ১০৭ (যুক্ত), ডিসেম্বর ২০২৫
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10607010

বৌদ্ধধর্মে গণতন্ত্রের নির্দেশনা: উৎসের সন্ধানে

নীরু বড়ুয়া*

Abstract: Gautama Buddha initiated a transformative shift in the realm of Indian socio-economic and religious thought in the 6th century B.C. He discusses the happiness, well-being, and welfare of individuals, especially the implementation of democratic practices. The practice of democracy significantly contributes to contemporary nation-building; almost 2500 years ago. The Buddha introduced democratic principles through the formation of the Saṅgha. The Saṅgha exemplified a paradigm of democratic rule. Democratic characteristics can be discerned from the Saṅgha's constitution, governance, and legacy. In ancient North India, there existed sixteen kingdoms, generally referred to as the sixteen Mahājanapada. The traditional governing systems of Shākay's Kapilāvastu, the Vriji's of Vaishali, and the Malla's of Kusinārā and Pāvā were democratic. The inclusive democratic principles of Voishali Vriji received significant commendation. Democratic procedures were established in the governance of Vriji long before the advent of the first modern democracy in Athens, Greece. Consequently, the democracy of the Vriji is said to as the cradle of modern democracy. The kingdom in which Buddha was born was likewise a democratic kingdom. Buddha articulated seven condition of welfare for mutual unity, harmony, and benevolence, which might be regarded as the foundation of contemporary governance and democracy. In a democratic governance system, individuals at all levels can exercise their rights and make decisions. In such a system of governance, society becomes increasingly affluent. Buddha's teachings offer a well-spoken comprehension of the path toward a people-centric democracy, which fosters accountability, rule of law, effective administration, and the establishment of a flourishing society.

মুখ্যশব্দ: গণতন্ত্র, সংঘ, বৌদ্ধধর্ম, সপ্তঅপরিহানীয় নীতি, মহাসম্মত।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১. ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত ও প্রসংসিত শাসনব্যবস্থার নাম 'গণতন্ত্র'। এটিকে সমাজব্যবস্থায় সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থাও বলা হয়। গণতন্ত্র শুধু শাসনপদ্ধতি নয়, সমাজবদলের অন্যতম হাতিয়ারও বটে। সচরাচর গণতন্ত্র বলতে এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের অধিকার, সমতা, মানবাধিকার, সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া, ভোটের অধিকারসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা থাকে। আর এই কারণে গণতন্ত্র বিশ্বব্যাপী খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গণতন্ত্র কাঙ্ক্ষিত ও স্বীকৃত রাজনৈতিক আদর্শ হলেও প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে এটির ব্যাপক চর্চা করা হয়। বৌদ্ধধর্মের সাথে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। গৌতম বুদ্ধ সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংঘের শক্তিশালী আইন ও সংঘের সদস্য রয়েছে। তাছাড়া সংঘ পরিচালনা করার জন্য রয়েছে প্রজ্ঞাবান একজন সংঘ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যাকে সংঘনায়ক তথা সংঘপ্রধান বলা হয়। সংঘ স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি সংগঠন যেখানে সকলপ্রকার সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিকভাবে গৃহীত হয়। বুদ্ধের এই সংঘকে বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্মে গণতন্ত্রের উৎসের একটি সম্যক ধারণা উপস্থাপন করা হবে।

২. গবেষণা পর্যালোচনা

বুদ্ধের কালে প্রাচীন ভারতে মগধ এবং কোশলসহ আরও অনেক বড় বড় রাজ্য ছিল। অনেক রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থারও প্রচলন ছিল। বুদ্ধ গোষ্ঠীকেন্দ্রিক শাসনপদ্ধতির চেয়ে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সর্বোত্তম বলে সমর্থন করেছিলেন যা স্থিতিশীল সমাজগঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে (Dipty, 2022, pp. 17474−17480)। বুদ্ধ প্রবর্তিত সংঘের মাধ্যমে গণতন্ত্রের সূচনা হয় বলে ওয়াই ইমামুরা জানান,

> Look at the first congregation (sangha) as founded by the Buddha himself. It was a perfect model of democracy. The principle of equality was carried out to its logical conclusion. He formulated a certain set of moral precepts according to the spirit of universal brotherhood. These were enforced upon himself as well as his Sangha, the object being to effect ethical elevation and religious sanctification. Caste distinctions were abolished, all the brethren in the faith stood on equal footing, as all the waters pouring into one immense ocean uniformly partook of one salty taste (Imamura,1918, p. 8).

দালাই লামা বলেন, 'বৌদ্ধধর্ম গণতান্ত্রিক ধর্ম না হলেও প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতার কথা সেখানে রয়েছে। বুদ্ধ সকলকে সমান মর্যাদা প্রদান করেছেন যা সত্যিই অভাবনী' (Lama, 1999, p. 1)। কাঞ্চনা ন্যগরানসি বলেন,

> On studying the government in Buddhism, originated from the Buddha, the word 'democracy' did not exist but the government was called 'Sangha' (Buddhist monks). This has been considered as the monk government form. However the essence of government in terms of doctrine has been focused more than on the form (Ngourugsi, 2017, pp. 1 – 11).

বুদ্ধদাস পি. কির্ত্তিসিংহে বৌদ্ধধর্মের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি এবং মানবাধিকার সম্পর্কে বলেন,

> The Buddha pointed out the absolute folly of artificial distinctions between man and man. At thetime of the Buddha there was a rigid caste system in India. It determined and fixed men place in the social order by the mere fact that one's father was of such and such a descent and had such and such an occupation. The low castes were denied an education and were placed low on the social ladder and this with such rigidity that a low caste man could hardly break out of his situation. The Buddha revolted against this injustice and asserted the equality of all men as far as their basic rights are concerned (Leidecker & Kintlisirghe, 1973, pp. 18–19).

গণতন্ত্র সর্বোত্তম রাজনৈতিক ব্যবস্থা না হলেও অনান্য শাসনব্যবস্থার চেয়ে উত্তম। বৌদ্ধধর্মে গণতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ ধারণা না থাকলেও বেশ কিছু গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম বলে *`Democracy on Buddhistic Approach'* প্রবন্ধের মাধ্যমে জানা যায় (Klaydesh, Chaimesik & Yaemsomthorr, 2017, pp. 137–150)।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

গৌতম বুদ্ধের ধর্ম আদি, মধ্য এবং অন্ত কল্যাণের ধর্ম যা সাম্য, অহিংসা, মৈত্রী এবং নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর শিক্ষায় নীতি-নৈতিকতায় সুখি, সমৃদ্ধ, মানবিক সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের দিক-নির্দেশনা রয়েছে। তিনি ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সর্বস্তরের সাধারণ জনগণ নিয়ে গঠন করেন 'সংঘ'। এটি গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক একটি সংগঠন যেখানে প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ডের জন্যে সংঘের প্রত্যেক সদস্যকে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হয়। আধুনিক বিশ্বে প্রচলিত

গণতান্ত্রিক চর্চার ধারা বুদ্ধের সংঘব্যবস্থাপনা এবং প্রাচীন ভারতের গোষ্ঠীনির্ভর কিছু কিছু অঞ্চলে ছিল। বর্তমান প্রবন্ধটিতে বৌদ্ধধর্মে গণতন্ত্রের উৎসের বিচার-বিশ্লেষণ করাই গবেষণার অন্যতম মূল্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাকর্মটি বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রাথমিক উৎস হিসেবে পবিত্র ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থের অধ্যায়, গবেষণাধর্মী জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং অনলাইনে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ থেকে পাওয়া তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

৫. বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা

৫.১. গণতন্ত্রের ধারণা

গ্রিসের এথেন্সে প্রথম আধুনিক গণতন্ত্রের আর্বিভাব হয়। মুলত রাজনৈতিক দর্শনের ফসলই হলো গণতন্ত্র। ইংরেজি ‘Democracy’শব্দটির গ্রিক প্রতিশব্দ ‘demokratia’। এখানে ‘demokratia’শব্দটি ‘demos’ এবং ‘kratia’ দুটি অর্থবোধক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। ‘demos’ এবং ‘kratia’ শব্দ দুটির অর্থ হলো যথাক্রমে ‘people’ এবং ‘power’। অর্থাৎ, জনগণ এবং ক্ষমতা। এ প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে,

> In ancient Greece, where the origins of modern democracy lie, demokratia was a straight form of law where the people both constituted the polity and applied power (Hobson, 2015, p. 8).

বর্তমানে পুরোবিশ্ব মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উদার ও মানবিক গণতন্ত্র চর্চার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

গণতন্ত্রে সকলপ্রকার ক্ষমতার উৎস বলা হয় জনগণকে। আব্রাহাম লিংকনের মতে, ‘জনগণের কল্যাণের জন্য জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থাই হলো গণতন্ত্র’ (শামছুর, ১৯৯৪, পৃ. ৪২৯)। আবার এ বিষয়ে গেটেল বলেন, ‘গণতন্ত্র হলো এমন এক ধরনের শাসন পদ্ধতি যেখানে জনগণকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকার দেওয়া হয়’ (সাদি, ২০১০, পৃ. ৪৬৬)। আধুনিক শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা-বিশ্বাস প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বকে তথ্য ও প্রযুক্তিযুক্ত তথা ন্যানো প্রযুক্তির যুগ বলা হয়। প্রযুক্তিযুক্ত এই বিশ্বে গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সর্বস্তরে মানুষকে শাসক স্বাধীনতা, অধিকার, সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা এবং শান্তিপূর্ণ সতত সুন্দর নিরাপদ জীবনযাপনের ব্যবস্থা

করা হয়। বহুত্ববাদী গণতন্ত্র সর্বত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও অনেক সময় তার ব্যর্থতাও দেখা যায়। গণতন্ত্রের প্রধান কাজ হলো মানবাধিকার নিশ্চিত করা, স্বাধীনতাকে সম্মান করা, মতামত প্রকাশকে সম্মান করা যেখানে বহুজনের সুখ ও কল্যাণ নিহিত থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় একটি সুখি, সমৃদ্ধ ও কল্যাণকর মানবিক রাষ্ট্র গঠন করা।

গণতন্ত্র নন্দিত ও প্রশংসিত এক শাসনব্যবস্থার নাম। মানবতাবাদ, উদারতা, সাম্য প্রতিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা, বাকস্বাধীনতা এবং সচেতনতা প্রদান করাকে গণতন্ত্রের অন্যতম গুণ বলা হয়। সুষ্ঠু নির্বাচনে গণতন্ত্রকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেওয়া হয় আজও। কিন্তু গণতন্ত্রের সফলতা হিসেবে শিক্ষা, অন্ন, বস্ত্র, খাদ্য, বাসস্থানসহ দক্ষ নেতৃত্ব, সাম্যতা, সমদৃষ্টি-আচরণ, শৃঙ্খলা, ধৈর্য্যসহনশীলতা, মানবাধিকার এবং আইনের শাসনও খুবই গুরুত্বপুর্ণ। এমতাবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামো সুসংহতকরণে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় খুবই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মে নির্দেশিত গণতান্ত্রিক নির্দেশনা সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে বেশ জোরালো ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫.২. গণতান্ত্রিক রাজা মহাসম্মত

অতীতে রাজা বলে কখনো কোনো শাসক বা প্রশাসক ছিল না। তবে সর্বস্তরের জনসাধারণ রাজ্যশাসনের জন্য যাঁকে সবচেয়ে দক্ষ, উদার, মানবিক, গণতান্ত্রিক, নির্ভরযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে মনে করতেন তাঁকেই রাজারূপে নির্বাচন করতেন বলে *'জাতক'* গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায় (ঈশানচন্দ্র, বা. ১৩৮৪, পৃ. ১২)।প্রচলিত প্রাচীন রাজার একটি ধারণা *'দীর্ঘ নিকায়'* গ্রন্থের *'AM&MT&T সূত্রে'* চমৎকারভাবে উল্লেখ রয়েছে। পৃথিবীতে কীভাবে রাজার ধারণা আসে এবং প্রসারতা লাভ করে তা উপরিউক্ত সূত্রটিতে বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। এখানে রাজার উৎপত্তি সর্ম্পকে বলা হয়েছে এভাবে,

> আদিতে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর এবং মানুষের আবির্ভাব হয়। সেই সময় মানব সম্প্রদায় ছিল খুবই সহজ-সরল এবং উদার। পারস্পরিক কোনোরকম ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হতো না। একসময় তারা শষ্য উৎপাদন ও ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করতে শুরু করলো। জমির মালিকানা নিয়ে চাষাবাদ শুরু করে ফসল উৎপাদন করতে শুরু করলো। এমতাবস্থায় দেখা যায়, একসময় অন্যের জমিকে লোভবশতঃ নিজের জমি বলে দাবি করতে থাকে, যার ফলে শুরু হয় নানারকম অনিয়ম এবং বিশৃঙ্খলা। ক্রমান্বয়ে তারা চুরি করতে শিখলো; মিথ্যা বলতে শিখলো; পরনিন্দা করতে শিখলো এবং হিংসা করতে শিখলো। এক পর্যায়ে সমাজের পরিবেশ অশান্ত-অস্থির হয়ে উঠলো। সমাজে নানারকম অপরাধ প্রবণতাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় সমাজের এরূপ অবস্থা দেখে সবাই হতভম্ব,

> নির্বাক, ভীত-সন্ত্রস্ত এবং চিন্তিত। তাই সর্বস্তরের জনগণ মিলে এই অরাজক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য উপায় অনুসন্ধান করতে লাগলো। ত্রাতা হিসেবে তারা সুদর্শন, সুন্দর, দক্ষ, নিরপেক্ষ, মানবিক, গণতান্ত্রিক, প্রজ্ঞাবান, শৃঙ্খলিত, আদর্শিক ও নীতিবান ও জনদরদী শাসক বা প্রশাসক নির্বাচিত করতে চেয়েছিল, যিনি সকলের অন্তরে আপন মহিমায় স্থান করে নিবেন। আর সকলেই একত্রিত হয়ে মহান সুদর্শন ব্যক্তির নাম দিয়েছিলেন 'রাজা'। এই রাজা হবেন দেশ বা রাজ্যের অধিপতি এবং প্রজাসাধারণের সবধরনের সুখ-দুঃখের চিরসাথী। যেহেতু সর্বস্তরের জনসাধারণ কর্তৃক তিনি নির্বাচিত সেহেতু তাঁকে মহাসম্মত বলে সম্বোধন করা হতো (শীলভদ্র, ২০০৭, পৃ. ৯৫)।

রাজার উৎপত্তি বিষয়ের উপরিউক্ত উদ্ধৃতির মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সেই সময় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে রাজা নির্বাচন করা হতো। সকলের সম্মতিতে নির্বাচিত রাজা বলেই তাঁকে 'মহাসম্মত' বলা হয়। রাজা হিসেবে মহাসম্মত ব্যক্তি এবং সামষ্টিক সম্পদকে রক্ষা সর্বদা করতেন। মহাসম্মত পরবর্তী সময়ে বেশ সুনামের সাথে দীর্ঘদিন রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। তাছাড়াও *'উলুক জাতক'*-এ রাজার উৎপত্তি কীভাবে হলো এ বিষয়েও চমৎকার একটি আলোচনা রয়েছে। এখানেও বিভিন্ন অপরাধ, চুরি, মিথ্যাচার, ঝগড়া-বিবাদ থেকে রক্ষা পাওয়া সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একজন বিচক্ষণ, সুদক্ষ ও ন্যায়-পরায়ণ রাজার প্রয়োজন প্রসঙ্গে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায় (ঈশানচন্দ্র, বা. ১৩৮৪, পৃপৃ. ২২১–২২২)।

৫.৩. গণতান্ত্রিক চর্চার রূপ-রূপান্তর

লোভ, দ্বেষ, মোহ এবং রাগ ও ঘৃণা হতে দূরে থেকে চিত্তবিশুদ্ধি ও নির্মোহ লাভের অধিকারী হওয়া যায় যা বুদ্ধের শিক্ষায় রয়েছে। তিনি ছিলেন সকল প্রকার বর্ণ-বৈষম্য প্রথা নিরসনের অগ্রদূত। সবধরনের ভেদাভেদ বিদূরিত করে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সবাইকে তাঁর ধর্মে প্রবেশাধিকারের সুযোগ করে দিয়ে তিনি সমতাভিত্তিক, বৈষম্যহীন, নৈয়ায়িক এবং সাম্যতার সংঘ গড়ে তোলেন। এখানে তাঁর অনুশাসনে সবাইকে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়ে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে আরো বেশি বেগবান করে তোলা হয়। মুক্তি ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসীদের নিকট গণতন্ত্র মূল্যবান ও বহুলকাঙ্ক্ষিত মূল্যবান সম্পদ। অতীতে গণতন্ত্রের জন্য অনেক রাষ্ট্র বা দেশের জনগণ সংগ্রাম করেছে এবং এখনও করে চলেছে। বুদ্ধ রাজনৈতিক শাসন বা সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে কোনোরকম উপদেশ বা অনুশাসন প্রদান করেননি। তবে, তাঁর সার্বিক দিক-নির্দেশনামূলক শিক্ষায় গণতন্ত্রের কাঠামো সর্ম্পকে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সংঘ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি গণতন্ত্রের সূচনা করেন। বুদ্ধ প্রদর্শিত গণতন্ত্রের সম্যক চর্চা সমাজ বা রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

বুদ্ধ 'গণ' বা 'সংঘ'-কে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ তাঁর প্রথম ৬০ জন অর্হৎ ভিক্ষুকে আহ্বান করে বলেন,

> হে ভিক্ষুগণ! তোমরা বহুজনের সুখের জন্য, কল্যাণের জন্য, জগতের অনুকম্পা প্রর্দশনের জন্য, দেবতাসহ মানুষের কুশল ও মঙ্গলের জন্য দিকে দিকে বিচরণ কর। কিন্তু একদিকে দুইজন যেও না। আর আমি নিজেও উরুবেলার সেনানী গ্রামের দিকে রওনা যাত্রা করব (প্রজ্ঞানন্দ, ১৯৩৭, পৃ. ২২)।

এখানে বুদ্ধকে মানবতার ধারক ও বাহক এবং যুগনায়ক হিসেবে দেখা যায়। তাঁর এই সর্বজনীন উপদেশে দেব-মানবসহ সকলের হিত, সুখ এবং কল্যাণের জন্য মহান ভিক্ষু-সংঘকে সর্বদা বিচরণ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। মানুষের হিত, সুখ এবং কল্যাণ সাধনে কোনো প্রকার বর্ণ-বৈষম্য বা ধনী-গরিবের মধ্যে পার্থক্য করার কোনো সুযোগ নেই। এখানে বুদ্ধ সমগ্র দেব-মানব সম্প্রদায় এবং সকল প্রাণির কল্যাণে ভিক্ষু-সংঘকে নিরলসভাবে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। মানব-ইতিহাসে এই ধরনের সর্বজনীন উক্তি মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজগঠনে অগ্রণী ভূমিকা পলন করে। তিনি দরিদ্র-ধনী, দীন-দুখি, আর্য-অনার্য, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র বিভাজন করেননি। বিভাজন করেননি কোনো নারী-পুরুষে। তাঁর শিক্ষা-দর্শনে অন্তর্ভুক্তি হিসেবে দেখা যায় সর্বস্তরের জনসাধারণ। বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের তিলৌরকটের পিপরাঁওয়া প্রাচীন শাক্য প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ছিল। কপিলাবাস্তুর শাক্যরা 'গণসংঘ' বা গণরাজ্যের অর্ন্তভুক্ত ছিল। বুদ্ধ গণরাজ্যের পুত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় তিনি গণতন্ত্রের সাথে খুব অল্প বয়স থেকেই সম্যকভাবে পরিচিত ছিলেন– এমনটি ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর কর্মযুক্তোত্তর জীবনে গণতান্ত্রিক নিয়ম-রীতি ও সংস্কৃতির স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়।

৬. গণতন্ত্র ও সংঘ

'ব্যক্তি', 'গণতন্ত্র' এবং 'সংঘ' একে-অপরের পরিপূরক। বৌদ্ধধর্মে সংঘ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের বিকাশ লাভ করতে দেখা যায়। এখানে 'সংঘ' বলতে বহুজনের একত্রীকরণকে বোঝায়। সংঘভুক্ত সদস্যরা প্রচলিত নিয়ম-নীতি বা বিনয়-বিধান মেনে চলতেন। ম্যাকাইভার-এর 'সংঘ' বিষয়ে উক্তিটি এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: 'সংঘ হচ্ছে সামাজিক এমন এক সংগঠন যা কোনো সাধারণ স্বার্থ বা একাধিক স্বার্থ সাধনের সাথে সংশ্লিষ্ট' (শামছুর, ১৯৯৪, পৃ. ৪১১)। 'সংঘ' শব্দের শব্দগত অর্থ হলো সমিতি, প্রতিষ্ঠান, দল ইত্যাদি। বৌদ্ধধর্মে সংঘ বলতে ভিক্ষু-সংঘ এবং ভিক্ষুণী-সংঘকে বোঝায়। বুদ্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত সংঘে জাতপাত কিংবা বর্ণবৈষম্যের স্থান নেই। ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য-শূদ্র, গায়ক-গায়িকা এমনকি গণিকা, নাপিত, ঝাড়ুদার পুত্র প্রভৃতি লোকের সংঘে প্রবেশাধিকারের অধিকার রয়েছে। মানুষ সামাজিক জীব। নানা শ্রেণি-পেশা, ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষের বসবাস রয়েছে সমাজে। সমাজ ব্যতীত কখনো

মানুষ বাঁচতে পারে না। বুদ্ধ সমাজের প্রয়োজনেই সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। *'মধ্যম নিকায়'* গ্রন্থের দক্ষিণাবিভঙ্গ সূত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, একসময় বুদ্ধ কপিলাবাস্তুর নিগ্রোধারামে বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী কর্তৃক প্রদত্ত নতুন বস্ত্র গ্রহণ না করে তা উপস্থিত সংঘকে প্রদান করার পরামর্শ দিয়েছিলেন (বিনয়েন্দ্রনাথ, ১৯৯৩, পৃ. ১৯২)। অর্থাৎ, এখানে বুদ্ধকে সংঘকেই প্রাধান্য দিতে দেখা যায়। সংঘকে প্রদান করলে সংঘ ও তিনি (বুদ্ধ) পূজিত হবেন। সমাজব্যবস্থায় এককভাবে কোনো কাজই কখনো পরিপূর্ণতা সাধন সম্ভবপর নয়। তাই একতার প্রয়োজন রয়েছে। আর সেই একতার নাম হলো 'সংঘ'। *'ইতিবুত্তক'* গ্রন্থের *'একতা সূত্রে'* সংঘের একতায় সুখ বৃদ্ধি পায়, গণতান্ত্রিক চর্চা সমুন্নত থাকে এবং পরস্পর সকলেই সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারে বলে উল্লেখিত (মেত্তাবংশ, ২০১২, পৃ. ১৩)।

৬.১. বৌদ্ধসংঘ প্রতিষ্ঠা

বুদ্ধ প্রবর্তিত সংঘের সংবিধান হচ্ছে গণতান্ত্রিক। এখানে সংঘ একক ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কোনো সংগঠন নয়। এটি বিনয় তথা আইন অনুসারে পরিচালিত হয়। বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত সংঘে কেউ কোনো অপরাধ করতে পারে না। কোনো অপরাধ করলে বুদ্ধোপদিষ্ট বিনয় অনুসারে সংঘ হতে তাঁর বহিস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। বুদ্ধ বর্ণবৈষম্য প্রথাবিরোধী প্রজ্ঞাযুক্ত কৌশল হিসেবে সংঘ প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেন এবং তাতে তিনি সফলও হোন। সংঘকে শ্রেণি বিভাজন প্রথার বিরুদ্ধে একটি সমতাভিত্তিক নৈয়ায়িক সংগঠন বলা হয়। বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ বারানসীর ইসিপতনের মৃগদাব বনে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যকে[১] নিয়ে সর্বপ্রথম প্রথম সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে সংঘের সদস্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। তাই তাঁকে সংঘ প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত সংঘ বিশেষ দুই ভাগে বিভাজিত। যথা:

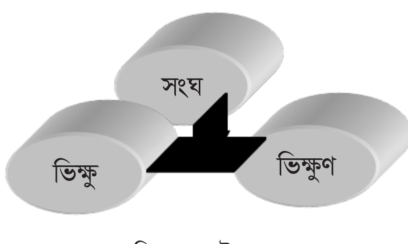

চিত্র ১ : বৌদ্ধ সংঘ

এখানে যে সমস্ত পুরুষ সংসারধর্ম ত্যাগ করে দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য পুত-পবিত্র সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন তখন তিনি ভিক্ষু সংঘের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হোন। আর যে সমস্ত নারী সংসারধর্ম ত্যাগ করে দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন তখন তিনি ভিক্ষুণী সংঘের সদস্য হিসিবে নির্বাচিত হোন। বুদ্ধ প্রবর্তিত ভিক্ষুসংঘে রাজপুত্র থেকে শুরু করে চণ্ডালপুত্র আর

ভিক্ষুণীসংঘে রাজকন্যা থেকে শুরু করে বারবণিতা পর্যন্ত বুদ্ধের অনুশাসনের উত্তরাধিকারী হয়ে সংসার নামক দুঃখের সাগর থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করেন। বুদ্ধ নারীদের জন্য আলাদাভাবে ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠা করে এক অনন্য সাধারণ নজির স্থাপন করেছিলেন যা অচিন্ত্যনীয় (মণিকুন্তলা, ২০১০, পৃ. ৯)।

বৌদ্ধসংঘে সকলের প্রবেশাধিকারের সমানাধিকার থাকায় এটিকে মহাসাগরের সাথে তুলনা করা হয়। মহাসাগরে যেমন নদীগুলো এসে মিশে গিয়ে পূর্ব নাম হারিয়ে ফেলে তেমনিভাবে সংঘে প্রবেশাধিকার লাভ করে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও শ্রেণি পেশার মানুষ তাদের পূর্বনাম কিংবা বংশের নাম ভুলে গিয়ে সকলেই সংঘ নামে পরিচিতি লাভ করে। এ বিষয়ে বুদ্ধ বলেন:

> গঙ্গা, যমুনা, অচিরাবতী, সরভূ, মহী, আদি মহানদী মহাসমুদ্রে এসে যেমন নিজেদের পূর্ব নাম ও গোত্র পরিত্যাগ করে মহাসমুদ্রে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্র এ চার গোত্রের জনসাধারণ বুদ্ধের শাসনে এসে পূর্বের নাম, গোত্র এবং বংশ ত্যাগ করে শাক্যপুত্র নামে পরিচিতি লাভ করে (জ্যোতিপাল, ২০১৩, পৃ. ১৩৯)।

বুদ্ধ শাসনের উত্তরাধিকারী হলে তখন আর কেউ পদবীধারী কোনো ব্যক্তি থাকে না। থাকে না কোনো পারিবারিক সংশ্লিষ্টতা। সকলেই শাক্যপুত্র নামেই পরিচিতি লাভ করে।

বুদ্ধের সময়ে ব্রাহ্মণরা নিজেদেরকে উচ্চবংশজাত বলে অহংকার করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতেন। কিন্তু বুদ্ধ দাবিটির অযৌক্তিকতা সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। তাই তিনি কর্মের ভিত্তিতে উচুঁ (ব্রাহ্মণ) নিচু (চণ্ডাল) করার পরামর্শ প্রদান করেন। জন্মে নয়, আপন কর্মে উচুঁ-নিচু হয়। যে ব্যক্তি সৎ ও জ্ঞানী, সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত, অহংকার বা দোষমুক্ত, আত্মসংযমী, কুশলকর্ম সম্পাদনকারী এবং জ্ঞানের সাধনায় অভিরত তিনি ব্রাহ্মণ পদবাচ্য– অন্য কেউ নয়। বুদ্ধ বলেন: 'জন্ম বা জাতি দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, জন্ম বা জাতি দ্বারা কেউ অব্রাহ্মণ হয় না। কর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ আর কর্ম দ্বারা অব্রাহ্মণ হয়' (সাধনানন্দ, ২০০৭, পৃ. ১৭৭)। তিনি আরও বলেন: 'যাঁর অন্তরে কোনো লোভ-দ্বেষ-মোহ, মিথ্যা আশ্বাস, প্রতারণ নেই, সেই নিত্যদৃঢ় পরাক্রমশালী ব্যক্তি যে-ই হোক পরম বিশুদ্ধি লাভ করবে' (শীলানন্দ, ২০০৯, পৃ. ১০৯)। *'দীঘ´নিকায়'* গ্রন্থের *অম্বটঠ* সূত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, গুণবান, প্রজ্ঞাবান ও বিদ্যাচরণসম্পন্ন ব্যক্তি যে বর্ণ-গোত্র বা ধর্মে জন্মগ্রহণ করুক না কেন তিনি সর্বত্রে পূজনীয় এবং শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে নন্দিত এবং সম্মানিত হোন (প্রজ্ঞানন্দ, ১৯৩৭, পৃপৃ. ২০৬–২০৯)। এখানে বুদ্ধ যার মধ্যে সততা, ন্যায়-পরায়ণতা, পুত-পবিত্রতা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষাসহ মানবিক গুণাবলি রয়েছে তাঁকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ অভিহিত করেন। বুদ্ধ জন্ম এবং জাতি

দ্বারা ব্রাহ্মণ পদবাচ্য অযৌক্তিকতা তুলে ধরে মানবতাকে ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। বুদ্ধই সর্বপ্রথম বর্ণ-বৈষম্য প্রথা বিলোপ সাধন করে একটি সমন্বিত সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করেন যেখানে সাম্য-মৈত্রী-সমতাভিত্তিক সমাজব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয়। বুদ্ধ মানুষের স্বতন্ত্র মর্যাদাকে স্বীকার করে নিয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশসাধনে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেন,

> ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানুষকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই। যাগ-যজ্ঞের অবলম্বন হতে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। মানুষে যে দীন দেবাধীন পদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২, পৃ. ৪০)।

৬.২. গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি

বুদ্ধ শুধু সংঘ সৃষ্টি করেননি– সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সংঘ পরিচালনার জন্য বিনয়-বিধানের নির্দেশনাও প্রদান করেন। তিনি সংঘে সকলের অংশীজন হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে মানবমর্যাদা এবং গণতান্ত্রিক চেতনাবোধকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সকলের মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ থাকে যে, সকলেই সংঘে প্রবেশ করে নব উদ্যমে বুদ্ধের বিনয়-বিধান অনুসারে স্ব-স্ব কর্ম সম্পাদন করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হোন। এখানেও বুদ্ধের গণতন্ত্রের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত সংঘ মানব ইতিহাসে অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে কে এন জয় সোয়্যাল-এর উক্তিকে উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন, 'The Buddhist Sangha was copied out from the political Sangha of the republic' (Jaysawal, 1943, p. 664). এস দত্ত-এর কথায়ও একই সুর দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'the constitution of Buddhist Sangha was perfectly democratic' (Dutta, 1924, p. 180). এখানেও বুদ্ধ নির্দেশিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হয়। তিনটি বিশেষ মূলনীতির ওপর বুদ্ধের সংঘ প্রতিষ্ঠিত। যথা:

- বিনয় বা নিয়ম-নীতি
- সংহতি ও পবিত্রতানির্ভর শাসনতান্ত্রিক সংগঠন
- সমাজমনস্কতা

উপরিউক্ত এই তিন নীতি বৌদ্ধ সংঘের খুবই অনুসঙ্গ বিষয়। বিনয় পিটকের '*মহাবর্গ*' গ্রন্থে বিশ বছর পূর্ণ না হলে কেউ বৌদ্ধ শাসনের উপসম্পদা[২] লাভ করতে পারে না বলে উল্লেখ রয়েছে (প্রজ্ঞানন্দ, ১৯৩৭, পৃ. ৯১)। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সকলের জন্য উন্মুক্ত। প্রাক্ বৌদ্ধ

শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রিবেদ একেবারে বাধ্যতামূলক হলেও বুদ্ধের সময়ে তা প্রয়োজন হয়নি। পরবর্তীসময়ে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসার হয়। বুদ্ধের বিনয়ী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সংঘজীবনের মধ্য দিয়ে কর্মচিন্তার সুগভীর প্রভাবে ও বুদ্ধজীবনের অনন্যসাধারণ ও গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত অধ্যায়গুলোর চিরাচরিত আদর্শ গণশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হয়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতে চলমান সমাজব্যবস্থার বিরূদ্ধে তিনি সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করেন। ফলে সকল শ্রেণি পেশার মানুষ সংঘে নিজেদেরেকে যোগ্য করে তোলেন। প্রজ্ঞার মাপকাটিতে শিক্ষাগুরু নির্বাচিত করা হতো। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সেই সময় শিক্ষাব্যবস্থাও যে গণতান্ত্রিক ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৬.৩. স্বাধীনতা

বুদ্ধ কখনোই ভিক্ষু-সংঘের ওপর কোনো কিছু জোর করে চাপিয়ে দেননি। সকল প্রকার কর্মকাণ্ডে ভিক্ষু-সংঘ বুদ্ধের বিনয়-বিধান বা আইনকে পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে চলে জীবনযাপন করতেন। এ বিষয়ে *‘মহাপরিনিব্বানং সুত্তং’* গ্রন্থে বর্ণিত বুদ্ধের উক্তিকে উপস্থাপন করছি। এখানে তিনি বলেন,

> হে ভিক্ষুগণ! আমি বর্তমানে তোমাদের জন্য যে সকল উপদেশ বা নির্দেশনা প্রদান করছি, তন্মধ্যে কোনো কোনো শিক্ষাপদ ভবিষ্যতে এমনও প্রতীয়মান হতে পারে যে তাদ্বারা কোনো মঙ্গল বা কল্যাণ সাধিত হচ্ছে না। তখন সকল ভিক্ষু-সংঘ শিক্ষাপদটি বর্জনে একমত হলে তা বর্জন করতে পারবে। আবার ভবিষ্যতে মঙ্গল ও কল্যাণকর বলে মনে হলে ভিক্ষু-সংঘ তা গ্রহণ করতে পারবে (ধর্ম্মরত্ন, ১৯৫৪, পৃ. ১৪২)।

তাছাড়া একসময় আনন্দকে উপলক্ষ্য করে বুদ্ধ বলেন,

> হে আনন্দ! তোমাদের এরূপ মনে হতে পারে যে, শাস্তার উপদেশ শেষ হলো, আমাদের শাস্তা নেই। এরূপ ধারণা কখনো পোষণ করবে না। আমার অবর্তমানে আমার দেশিত ধর্ম-বিনয়কেই তোমাদের শাস্তা হিসেবে জানবে। আমার অবর্তমানে ভিক্ষু-সংঘ ইচ্ছা করলে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলো বাতিল করতে পারবে (ধর্ম্মরত্ন, ১৯৫৪, পৃ. ১৪২)।

এখানেও তিনি ভিক্ষু-সংঘকে গণতান্ত্রিক চর্চা করার সুযোগ প্রদান করেন। আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন সংগঠনের নীতি নির্ধারণের সময়ে এরূপ নিয়ম-নীতি পালন বা গ্রহণ করতে আজও দেখা যায়। একই জায়গায় একত্রে থাকলে অনেক ক্ষেত্রে মতানৈক্য হতে পারে। কিন্তু বুদ্ধের সংঘে

কোনোরকম মতানৈক্য বা বিরোধ হলে তা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমাধান করা হতো বলে উল্লেখ রয়েছে (Goyal, 1987, p. 168)।

ব্যক্তি মাত্রই ভুল করতে পারে। সচরাচর জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। বুদ্ধ নিজেও তা ভালো করে জানতেন। এ বিষয়ে *'অঙ্গুত্তর নিকায়'* গ্রন্থের *'প্রবারণা সূত্রে'* বর্ণিত বুদ্ধের সাথে ভিক্ষুদের কথোপকথন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে দেখা যায় একসময় ৫০০ (পাঁচশত) বৌদ্ধ ভিক্ষু নিয়ে বুদ্ধ শ্রাবস্তীর পূর্বারামে অবস্থান করেন। এমন সময় তিনি সমবেত ভিক্ষুদেরকে উপলক্ষ্য করে বলেন, 'হে ভিক্ষুগণ! আমার কায়িক বা বাচনিক বিষয়ে তোমরা কি কোনো দোষ-ত্রুটি দেখতে পাও না' (শীলানন্দ, ২০০৯, পৃ. ১২৮)। উল্লিখিত বাক্যাংশ থেকে বোঝা যায় যে, বুদ্ধ ভিক্ষু-সংঘদের অধিকার এবং স্বাধীনতা প্রদান করেন। এখানে তিনি ভিক্ষু-সংঘের প্রবারণার মাধ্যমে দোষ-ত্রুটি সংশোধনের ওপর বেশ গুরুত্ব প্রদান করেন। এখানে 'প্রবারণা' অর্থ বরণ করা, নিবারণ, মানা এবং নিষেধ করাকে বোঝায়। বিনয় বিধান অনুসারে, নিজেদের দৃষ্ট-শ্রুত, অথবা আশাঙ্কিত দোষ-ত্রুটি বা নৈতিক স্খলন নির্দেশ বা প্রদর্শনের জন্য সংঘকে সনির্বদ্ধ আহ্বানের নামই 'প্রবারণা'। এসময় ভিক্ষু-সংঘ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে কোনো অপরাধ বা অন্যায় কাজ করে থাকলে প্রবারণা করার বিধান রয়েছে। তিন মাস ভিক্ষু-সংঘের বর্ষাবাস সমাপনান্তে আশ্বিনী পূর্ণিমা দিবসে প্রবারণা পরিপালন করা হয়। দিবসটিতে পরস্পর-পরস্পরের মধ্যে অনুকূলতা, অপরাধ হতে উদ্ধারের নিমিত্তে দৃষ্ট, শ্রুত, অথবা আশাঙ্কিত ত্রুটি উত্থাপনপূর্বক প্রতিকার করেন (প্রজ্ঞানন্দ, ১৯৩৭, পৃপৃ. ২০৬–২০৯)। এভাবে সমাজগঠনে বৌদ্ধসংঘ একটি রোল মডেল হিসেবে বিবেচনাযোগ্য। শাসক এভাবে নিজেদের দোষ-ত্রুটি দেখে আত্ম-সমালোচনা করে সমাজের ব্যাপক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

৬.৪. সম-অধিকার

বুদ্ধ সবক্ষেত্রে সকলের সমতা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছেন। একসময় শাক্যরাজ ভদ্রীয়, অনুরব্ধ, আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিল, দেবদত্ত-এর সাথে ক্ষৌরকার পুত্র বুদ্ধের শাসনের উত্তরাধিকারী লাভের জন্য বুদ্ধের নিকট গমন করেন। বুদ্ধ জাতিভেদ প্রথার উর্দ্ধে গিয়ে নিচু সম্প্রদায়ভুক্ত ক্ষৌরকারপুত্র উপালিকে সর্বপ্রথমে বুদ্ধের শাসনে দীক্ষা প্রদান করেন (বিনয়াচার্য, ২০০৩, পৃ. ৪৭৬)। এখানে বংশগত কোনো অভিমান না থাকার জন্যই প্রথমে ক্ষৌরকারপুত্র উপালিকে প্রব্রজ্যা প্রদান করা হয়। বুদ্ধ শাক্যরাজ ভদ্রিয়, অনুরব্ধ, আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিল, দেবদত্ত বা ব্রাহ্মণপুত্র সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়নের সাথে উপালির মধ্যে কোনোরকম পার্থক্য করেননি। বরঞ্চ তাঁকে প্রথমেই প্রব্রজ্যা দিয়ে মানবমর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। ভিক্ষু-সংঘের মধ্যে বিনয়ে পারদর্শিতা লাভ করায় উপালীকে বুদ্ধ 'বিনয়ধর' উপাধিতেও ভূষিত করেন। মহামতি বুদ্ধকে বৈশালীতে ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠা করে নারীর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার পাশাপাশি সম-অধিকার প্রদান করতে দেখা যায় (বিনয়াচার্য, ২০০৩, পৃপৃ. ৫৯৮–৬০০)।এখানে রাজমহিষী

ক্ষেমা, গৌতমী প্রভৃতি উচ্চবংশীয় নারীদের সাথে একই সারিতে স্থান পেয়েছেন ক্রীতদাসী কন্যা পুন্না, বৈশালীর রাজগণিকা আম্রপালি, রাগৃহের শালবতী গণিকা, উজ্জয়িনীর সভা নর্তকী পদুমবতী, ব্যাধ কন্যা চাপা এবং স্বর্ণকারকন্যা শুভাসহ আরও অনেকেই। বুদ্ধ সবাইকে সম-অধিকার দিয়ে মানবাধিকারকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন বলে জানা যায় (শীলভদ্র, ২০০৭, পৃপৃ. ৭৬–৮৮)। এ প্রসঙ্গে আই বি হরনার-এর উদ্ধৃতি খুবই স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন,

> In the pre-Buddhist days the status of women in India was on the whole low and without honour. During the Buddhist period, there was a change. Women came to enjoy more equality and greater respect and authority than even hitherto accorded to them (Horner r, 195, p. 75).

৭. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বরূপ বিশ্লেষণ

সংঘের একতা সুখকর। সার্বিক উন্নয়ন তথা সমৃদ্ধিতে একতার কোনো বিকল্প নেই (Goyal, 1987, p. 168)। একতা বলতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রে বিরোধ দেখা দিলে তা নিষ্পতির জন্য ভোটের প্রয়োজন। ভোট মানে নির্বাচন। নির্বাচনে ভোটগ্রহণ আবশ্যক। বুদ্ধ কিন্তু নির্বাচনকে সমর্থন করেননি। তিনি প্রতিনিয়ত ভিক্ষু-সংঘকে শৃঙ্খলিতভাবে সভা করার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। বুদ্ধের সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভিক্ষু-সংঘের মধ্যে গোপনে ভোট দেওয়ার প্রথা ও ভোট গণনার ধারা প্রচলিত ছিল। ভিক্ষু-সংঘের প্রত্যেক সদস্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারতেন। ভোটাধিকার পরবর্তী সময়ে উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্তকেই সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হতো। সভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ, কোরাম পূর্ণ হয়েছে কিনা তা দেখা হয়। বুদ্ধ সংঘ বলতে কমপক্ষে চারজন ভিক্ষুর উপস্থিতিকে বুঝিয়েছেন বলে উল্লেখ রয়েছে (প্রজ্ঞানন্দ, ১৯৩৭, পৃপৃ. ৩৯২–৩৯৩)। এখানে সকল ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে কমপক্ষে বৌদ্ধ চারজন ভিক্ষু উপস্থিত থাকলে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান শুরু করতে পারে বলে জানা যায়। বিভিন্ন সভা-সমিতি বা সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে সভাপতির অনুমতি আবশ্যক। *'প্রাতিমোক্ষ'* গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যদি সভার উপযুক্ত সময় হয় এবং কোরাম পুর্ণ হয় তবে সভাপতির অনুমতি নিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা যায় (প্রজ্ঞালোক, ১৯৮৭, পৃ. ৩৪)।

বর্তমানে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় যে ভোট দান প্রক্রিয়া আমার দেখতে পাই বুদ্ধ আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও আগে গণতান্ত্রিক প্রথা চালু করেন ভিন্ন ভিন্ন শলাকা ব্যবহার করার মাধ্যমে (আশা, ২০০১, পৃ. ৪০)। এই শলাকাকে আধুনিক ভোট দানের গোপনীয় ব্যালটের সাথে তুলনা করা যায়। প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাপনায় আহ্বানকৃত সভায় একজন যেমন সভাপ্রধান

নির্বাচিত হোন তেমনিভাবে ভিক্ষু-সংঘের প্রত্যেক সভা বা সম্মেলনে একজন প্রবীন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে সভাপতি নির্বাচন করা হয় যাঁকে সংঘনায়ক বলা হয়। সুন্দর, সুষ্ঠ ও সুশৃঙ্খলবদ্ধভাবে সভা পরিচালনা করাই তাঁর অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। সভার শুরুতেই ভিক্ষু-সংঘ কম্মবাচা (কর্মবাক্য) পাঠকরণের মাধমে নিজেদের দোষ-ক্রুটি সংশোধন করে নেন। এই কর্মবাচা পাঠ হলো বর্তমানে শপথ বাক্য পাঠের মতো।

বিনয়কে বুদ্ধ শাসনের আয়ু বলা হয়। বিনয় থাকলে বুদ্ধের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হবে। নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা এবং চারিত্রিক বিশুদ্ধিকে বিনয় বলা। বুদ্ধ নির্দেশিত বিনয় বলতে ভিক্ষু-সংঘের প্রাত্যহিক পালনীয় এবং অনুশীলনীয় বিধি-বিধানকে বোঝায়। উপরি-উক্ত এই সাংঘিক বিধি-বিধানগুলো শ্রদ্ধার সাথে পালিত-অনুশীলিত হলে বুদ্ধের শাসন অবলুপ্ত হবে না কখনো। এখানে বুদ্ধ নৈতিক চরিত্র গঠনের ওপর জোর দিয়েছেন যা ভিক্ষু-ভিক্ষুণী এবং গৃহীদের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য। আধুনিক গণতন্ত্রের সফলতাও কিন্তু নৈতিক চরিত্রের ওপরও বহুলাংশে নির্ভর করে। ব্যক্তি নৈতিক চরিত্রের অধিকারী না হলে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনিয়ম, দুর্নীতি, ব্যভিচার খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়, যার ফলে সমাজে অসন্তোষ সৃষ্টি ও বৈরী পরিবেশ সৃষ্টি হয়। প্রশ্নবিদ্ধ হয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। এমনকি, সংবিধানবিরোধী কর্মের জন্য বিভিন্ন সংগঠন বা সংস্থা থেকে বহিস্কার করার পাশাপশি তার সদস্যপদও বাতিল ঘোষণা করা হয়। অনুরূপভাবে বৌদ্ধশাসনে ভিক্ষু-সংঘের মধ্যে কোনো ভিক্ষু অপরাধ করলে বা অপরাধী হলে সেই ভিক্ষুকে সংঘ থেকে বহিষ্কারের জন্য সিদ্ধান্ত করা হয়। তবে বহিষ্কার স্থায়ী হবে নাকি স্বল্প হবে তা নির্ভর করবে অপরাধী ভিক্ষু কর্তৃক সম্পাদিত অপরাধের মাত্রার ওপর। ভিক্ষু-সংঘ সচরাচর অপরাধের গুণগত মান বিবেচনা করে অপরাধীকে তার অপরাধের রায় প্রদান করেন (বিনয়াচার্য, ২০০৩, পৃপৃ. ৪৩–৪৭)। আধুনিক রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থাপনায়ও মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যকে তাঁদের কৃত-কর্মকাণ্ডের জন্য আইন সভার নিকট দায়ী থাকতে দেখা যায়। বুদ্ধ প্রবির্তত ভিক্ষু-সংঘ পুরোপুরি গণতান্ত্রিক কাঠামোতে বিশ্বাসী এবং গণতান্ত্রিকভাবেই তাঁরা সকল প্রকার কার্যক্রম সম্পাদন করেন।

৮. বৃজি গণরাজ্য

বৈশালী ছিল লিচ্ছবীদের রাজধানী। বুদ্ধের সময়ে শক্তিশালী রাজ্যের মধ্যে বৈশালীও অন্যতম ছিল। লিচ্ছবীর দৈহিক গঠন ও অবয়ব খুবই সুন্দর ছিল বলে জানা যায় (ধর্ম্মরত্ন, ১৯৫৪, পৃপৃ. ৪৮–৫০)। লিচ্ছবীদের উত্তরাধিকারী হলো বৃজি। বৃজিরা সর্বক্ষেত্রে শৌর্য-বীর্যে পারদর্শী ছিল যাদের প্রচলিত শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক চর্চা অব্যাহত ছিল। বৃজিদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে তাদের বেশ সুনাম ছিল। বর্তমান যে গণতন্ত্রের কথা জানা যায় তা আজ হতে প্রায় ২৬০০ বছরেরও পূর্বে উত্তর ভারতের বৈশালীতে সূচনা হয়। বৃজিরা বাহিরের শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য গণরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গণরাজ্যকে সংঘরাজ্যও বলা হয়। বৃজি ছিল স্বাধীন, সার্বভৌম ও সম-অধিকারসম্পন্ন একটি গণরাজ্য। গণরাজ্য প্রতিষ্ঠা করার

অন্যতম কারণ হলো গণরাজ্যের প্রতি পূর্ণ তাদের সমর্থন লাভ করা। পরবর্তী সময়ে সুসমৃদ্ধ বৈশালী শক্তিশালী গণরাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এভাবেই বৈশালীতে গণরাজ্যের মাধ্যমে গণতন্ত্রের সূচনা করা হয়। এখানে বৃজিদের গণগোষ্ঠীকে পরিচালনা করার জন্য আবার কিছু 'গণসংঘ' বা 'সমিতি' করা হয়। 'গণসংঘ' বা 'সমিতি'র সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই সকল প্রকার সম্পাদিত কর্মের প্রতি সদাশয় দৃষ্টি রাখত।

বুদ্ধ গণতন্ত্রের জন্য বৈশালীর প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর প্রবর্তিত সংঘও পরিচালন করা হতো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। বৈশালীতেই বৃজিরা কল্যাণকর, সুখী, সমৃদ্ধ সমাজবিনির্মাণে গণতন্ত্রকে একটি সুসংহত শাসনপদ্ধতি হিসেবে রূপ দেয়। জানা যায় যে, বৃজিরা শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐক্যবদ্ধতা এবং গণতন্ত্রচর্চায় খুবই উন্নত ছিল। বৃজিদের গণতন্ত্রকে আধুনিক গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়। এ কারণেই বৈশালীকেই গণতন্ত্রের তীর্থভূমি বলা হয়। সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থায় দরকার স্বার্থপরতা, লোভ, দ্বেষ, মোহ, ভোগের প্রবল ইচ্ছা ত্যাগ করা। আর মানবাধিকার ও সুশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলেই সর্বস্তরে সুখ-শান্তি, সামাজিক উন্নয়ন, সুশৃঙ্খলা, সংযম, সম্প্রীতি-সদ্ভাব বৃদ্ধি পাবে। সুশাসন ও মানবাধিকার চর্চায় গণতন্ত্র অসাধারণ ভূমিকা পালন করবে। বুদ্ধের সময়ে প্রাচীন উত্তরভারতে অখণ্ড রাজ্য বা দেশের পরিবর্তে সেখানে স্বতন্ত্রভাবে ১৬টি রাজ্যের্য উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় (সুমঙ্গল, ২০০৫, পৃ. ২৪০)। রাজ্যগুলো ষোড়শ মহাজনপদ নামেই সবচেয়ে বেশি পরিচিত যেগুলো কালক্রমে বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ষোড়শ মহাজনপদগুলোর কোনোটিতে রাজতন্ত্র আবার কোনোটিতে গণতন্ত্র শানব্যবস্থার প্রচলন ছিল। যথা:

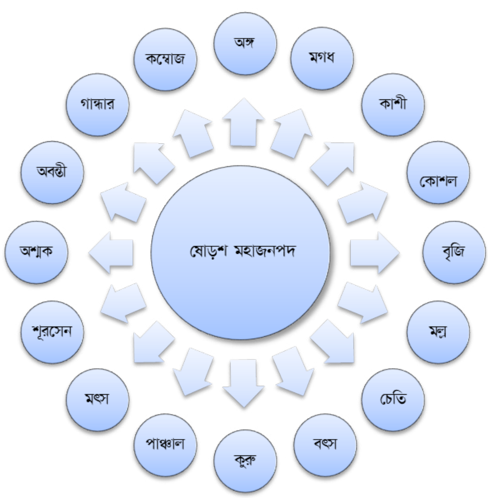

চিত্র ২: ষোড়শ মহাজনপদ

উল্লিখিত রাজ্যগুলোর ১০টি রাজ্যে গোষ্ঠীনির্ভর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলো হলোঃ কপিলাবাস্তুর শাক্য, রামগ্রামের কোলিয়, বৈশালীর লিচ্ছবী, কুশিনারার মল্ল, পাবার মল্ল, সুংসুমারগিরি ভগ্গ, অল্লকপ্পের বুলি, কেশপুত্রের কালাম, পিপ্পলিবনের মৌয এবং মিথিলার বিদেহ (Gnanapama, 1996, p. 65)। গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কপিলাবাস্তর শাক্য, বৈশালীর লিচ্ছবী, কুশিনারা মল্ল এবং পাবা ছিল খুবই প্রসিদ্ধ, যারা সকল প্রকার কর্মকাণ্ড সম্প্রীতি-সদ্ভাবের মাধ্যমে সম্পাদন করত। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাপনার প্রচলন ছিল (শীলভদ্র, ২০০৭, পৃ. ১০৯)। বৃজি গোষ্ঠীগুলোর শাসনকর্তা সাধারণত সর্বস্তরের জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হতো। রাজার নিজের পছন্দ মতো উত্তরাধিকারী নির্বাচন করার কোনো নিয়ম বা প্রথা ছিল না (Goyal, 1987, p. 47)।

৯. সপ্ত অপরিহানীয় নীতি

বৃজিরা খুবই উদ্যমী, সাহসী, কর্মঠ এবং নিষ্ঠাবান ছিলেন। বিনয়ী, সুসংহত ও সুশৃঙ্খলিত জনজাতি হিসেবে তাদের খ্যাতি ছিল। মগধরাজ অজাতশত্রু বেশ কয়েকবার বৈশালী আক্রমণ করে বৈশালী দখল করতে না পেরে তাঁর মন্ত্রী বস্‌সাকারকে বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করেন কীভাবে যুদ্ধে জয় করা যায় তা জানার জন্য। সেই সময় বুদ্ধ এ বিষয়ে আনন্দকে আহ্বান করে বললেন, যে জাতি সপ্তঅপরিহানীয় নীতি পালন করে তাদেরকে পরাজয় করা অসম্ভব। *'দীঘনিকায়'* গ্রন্থে বুদ্ধের উপদেশিত সেই সপ্তঅপরিহানীয় নীতির কথা উল্লেখ রয়েছে। এগুলো সর্বজনীন ও সর্বকালীন। সপ্তঅপরিহানীয় নীতিগুলো হলোঃ

- একত্র হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- একত্র হয়ে গৃহীত কর্ম সম্পাদন।
- অনিয়মকে প্রশ্রয় না দিয়ে প্রচলিত সুনীতিকে মেনে চলা।
- বয়োজ্যেষ্ঠদের ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্মান করা এবং উপদেশ মেনে চলা।
- কুল-কুমারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।
- গ্রাম ও নগরের ভিতরে বা বাহিরের চৈত্য ও বিহারের সংস্কার ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা।
- অর্হৎ ও শীলবান ভিক্ষুদেরকে চর্তুপ্রত্যয় ও আবাসনের ব্যবস্থা করা (ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, ১৯৫৪, পৃপৃ. ৪–৮)।

প্রথম দুটি অপরিহানীয় নীতিকে গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক। বুদ্ধ ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সংঘে সকলের প্রবেশাধিকারের সমান সুযোগ দিয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অধিকতর শক্তিশালী করেন। তিনি সমতা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে অযৌক্তিক ধর্মীয় বর্ণ-বৈষম্য ও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সবাইকে সমভাবে গুরুত্ব দিয়ে মানবাধিকারের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন, যেখানে সবাইকে এক এবং সর্বক্ষেত্রে সম-অধিকার প্রদান করা হয়। তৃতীয় নীতিতে প্রাচীন রাজধর্ম অনুসারে শাসনব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। বুদ্ধের সময়কালের রাজা শুদ্ধোদন, রাজা বিম্বিসার, রাজা অজাতশত্রু রাজা এবং রাজা প্রসেনজিত প্রমুখ এবং প্রজাসাধারণ রাষ্ট্রীয় অনুশাসন এবং রীতি-নীতি মেনে চলতেন। পরবর্তী সময়ে মহামতি সম্রাট অশোক, কনিষ্ক এবং পালরাজারা বুদ্ধের অনুশাসন মেনে রাজ্যের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলের। চতুর্থ নীতিতে মাতা-পিতা, বয়োবৃদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধের পূজনীয় ব্যক্তির পূজা, সেবা করা, গৌরবান্বিত ব্যক্তির গৌরব ও সম্মান করার বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য (সাধনানন্দ, ২০০৭, পৃ. ৭১)। পঞ্চম নীতিতে মাতৃজাতির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং মর্যাদা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ থাকে যে, মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অনুরোধে ভিক্ষু-সংঘ প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পর ভিক্ষুণী-সংঘ সৃষ্টি হয়েছিল (Durga,1939 , p. 163)। বুদ্ধ মাতৃজাতিকে সংঘে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে গণতন্ত্র ও মানবতার চর্চার ধারাকে সুসংহত করার পাশাপাশি মাতৃজাতির মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছেন। ষষ্ঠ নীতিতে স্তূপ ও চৈত্যকে সংরক্ষণ করার পাশাপাশি সেগুলোর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর কথা বলা হয়েছে। সপ্তম নীতিতে অর্হৎদের[৩] প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি তাদের সেবা-শুশ্রূষা তথা বসবাসের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে (সত্যপ্রিয়, ২০০৩, পৃপৃ. ৫৯৭–৫৯৯)।

উপরিউক্ত সপ্তঅপরিহানীয় নীতিতে গণতান্ত্রিক ধারাকে সর্বাগ্রে স্থান দিতে দেখা যায়। এখানে একতার কথা বলা হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঐক্যমতের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া আইনের শাসনের প্রতিও এখানে জোর দেওয়া হয়েছে। এই সপ্ত অপিরহানীয় নীতি পৃথিবীর যে কোনো স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের সামগ্রিক সুখ-সমৃদ্ধি এবং সকল প্রকার উন্নতিতে সূচক হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যুগেও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সপ্তঅপরিহানীয় নীতির প্রয়োজন অপরিহার্য।

১০. কল্যাণকর রাষ্ট্রগঠনে বুদ্ধের নির্দেশনা

কল্যাণকর সমাজগঠনে বৈশালীর বৃজিরদের অবদান অসামান্য। সেইসময় বৃজিদের শৌর্য-বীর্য ও একতার সুমহান আদর্শ ইতিহাস সন্ধিৎসুদেকে এখনো গভীরভাবে আকৃষ্ট করে (Bela, 1995, p. 41)। বুদ্ধের সময় বৈশালীতে উন্নত শাসনপদ্ধতির প্রচলন ছিল যেখানে বর্তমানে প্রচলিত গণতন্ত্রের পূর্বাবাস পাওয়া যায়। বৃজিদের সম্মেলন কেন্দ্রের নাম ছিল 'সন্থাগার'

(শীলানন্দ, ২০০২, পৃ. ১১১)। বুদ্ধ এই সন্থাগার নামের সম্মেলন কেন্দ্রটি বুদ্ধ উদ্বোধন করেন বলেও উল্লেখ রয়েছে (ধর্ম্মরত্ন, ১৯৯৪, পৃ. ৯৫)।গ্রন্থাগারটি ছিল বাংলাদেশের সংসদ ভবনের মতো। এখানে বসে বৃজিরা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করতেন। মানবতার মূর্তপ্রতীক বুদ্ধ সুখ-শান্তি এবং কল্যাণকর সমাজব্যবস্থার জন্য অপরিমেয় মৈত্রীর[৪] (loving kindness) কথা বলেছেন। সকলের প্রতি মৈত্রী, প্রেম আর সেবা পরায়ণতা তখনই সম্ভবপর হয় যখন আত্মপরতা বা স্বার্থপরতা ত্যাগ করে সবাইকে নিজের মতো করে দেখা যায়। কেননা, স্বার্থন্বেষীর মাধ্যমে কখনো প্রকৃত কল্যাণ সম্ভবপর নয়। তাই দরকার পরিবার, সমাজ, গ্রাম, শহর, উপশহর, নগর, উপনগর সর্বোপরি দেশ বা রাষ্ট্রের উন্নয়ন। তবেই একটি জনকল্যাণবান্ধব সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে যা গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চেয়ে অধিকতর গণতান্ত্রিক। বুদ্ধের উপদেশে উদার, মানবিক, মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক নীতির প্রায়োগিক ব্যবহার দেখা যায়। সবশেষে বলা যায়, কল্যাণকর সমাজবিনির্মাণ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধের গণতান্ত্রিক চেতনার ধারা জোরালো ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

১১. দশবিধ রাজধর্ম

রাজধর্ম বলতে রাজা বা শাসকের সতত সুন্দর ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। বুদ্ধ সুশাসন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি মানবতাবাদী সমাজ পরিচালনায় যেমন অঙ্গীকারবদ্ধ তেমনি আবার অন্যায়, অবিচার এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন খুবই সোচ্চার। ন্যায়বান শাসক না থাকলে কীভাবে একটি দেশ বা রাজ্য দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও ন্যায় বিচারহীন, অমানবিক হয় তাঁর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ '*অঙ্গুত্তর নিকায়*' গ্রন্থ হতে জানা যায়। এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে,

> গমনকালে প্রধান ষাঁড় যদি সোজাপথে চলে তবে অন্যসব ষাঁড় তাঁকে অনুসরণ করে সোজাপথে চলে। অনুরূপভাবে শাসক বা রাজা যদি সৎ ও ন্যায়ভাবে রাজ্যশাসন করেন তবে প্রজা-সাধারণও ন্যায়-পরায়ণ ও শৃঙ্খলিত হয়ে জীবনযাপন করে। এভাবে সৎ ন্যায়-পরায়ণ শাসককে অনুসরণ করলে রাজ্যে সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি এবং ন্যায়-পরায়ণতা বিরাজ করবে (ইন্দ্রগুপ্ত, সুমন ও অন্যান্য, ২০১৫ পৃপৃ. ৭৫–৭৬)।

সুশাসনের জন্য বুদ্ধ দশবিধ রাজধর্ম প্রবর্তন করেন। দশবিধ রাজধর্মগুলো যথাযথভাবে মেনে চলার কারণে সমাজে কোনোরকম অনিয়ম, অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, ন্যায়বিচারহীন এবং অমানবিক কার্যক্রম কখনোই পরিচালিত হতো না বলে জানা যায় (ঈশানচন্দ্র, বা.১৩৮৪, পৃ. ২৩৫)। তাছাড়া রাজপদে অধিষ্ঠিত থেকে রাজাকে দশবিধ রাজধর্ম পালন করতেও দেখা যায় (ঈশানচন্দ্র, বা.১৩৯১, পৃপৃ. ১৫৫–১৫৮; ধর্ম্মরত্ন, ১৯৫৪, পৃপৃ. ১২৮–১৫০)।

চিত্র ৩: দশবিধ রাজধর্মের বৈশিষ্ট্য

নৈয়ায়িক সমাজ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে বুদ্ধ যে দশবিধ রাজধর্মের কথা বলেন তা শাসন ব্যবস্থায় আজও খুবই অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যদি উপরি-উক্ত দশবিধ রাজধর্ম অনুসৃত হয় তবে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্রে কল্যাণ বিরাজ করার পাশাপাশি বৈষম্যহীন সমাজ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হবে এবং মানবাধিকারের লঙ্ঘন হবে না।

একজন প্রকৃত শাসকের মধ্যে যদি উপরি-উক্ত দশবিধ রাজধর্মের গুণাবলির সন্নিবেশ থাকে তবে তাঁর সুযোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্বে দেশ বা রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক যেমন হবে ও তেমনি হবে সর্বস্তরের জনগণের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। দশবিধ রাজধর্ম রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিপালন সেবা অনুসরণের মাধ্যমে শাসক কালোত্তীর্ণ শাসক হিসেবে পরিণত হয়ে অমর হয়ে থাকতে পারেন। *'দীর্ঘ নিকায়'* গ্রন্থের *'সিংহনাদ সূত্র'*-এর মাধ্যমে একজন শাসকের চার প্রকার আচরণের কথা জানা যায়। যথা: ক. নিরপেক্ষভাবে দেশ বা রাজ্য করা, খ, দেশ বা রাজ্য পরিচালনায় বিদ্বেষহীন হওয়া, গ. ন্যায় বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রাজ্য পরিচালনা করা এবং ঘ. শাসক হিসেবে ক্ষমতার অপব্যবহার না করে যথাযথ আইনের প্রয়োগ করা (শীলভদ্র, ২০০৭, পৃপৃ. ৪২–৭৫)। বুদ্ধের উপরিউক্ত সর্বজনীন ও চিরন্তন উপদেশ যা সমতা, সাম্যতা মানবমর্যাদা, উদারতা, গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা বিদূরিত করে স্থিতিশীল পরিবেশ গঠনে অসামান্য ভূমিকা পালন করবে।

১২. উপসংহার

বুদ্ধের অনুশাসনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র এবং ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ সকলের সমানাধিকার রয়েছে। রয়েছে সমান বাক্ স্বাধীনতা এবং শিক্ষা লাভ করার সুযোগ। বুদ্ধ গণতন্ত্র মনষ্ক ছিলেন বলেই ভিক্ষু-সংঘের জন্য গণতান্ত্রিক নীতিমালার প্রচলন করেন। একজন রাজপুত্র হয়েও তিনি বহুজনের মঙ্গল-কল্যাণ, সুখ-শান্তি সর্বোপরি দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেন। তাছাড়া তিনি সুশৃঙ্খলিত বৌদ্ধসংঘ প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্রের চর্চাকে আরও বেশি বেগবান করে তুলেছেন। মানবমর্যাদকে সমুন্নত করেছেন। সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠান করেছেন। বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত সংঘের গণতান্ত্রিক চর্চা আজও সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব রাখতে পারে।

অন্ত্য-টীকা

১. পঞ্চবর্গীয় শিষ্য: বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভ করার পর ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ বারানসীর ইসিপতন বা ঋষিপতনের মৃগদাব বনে প্রথম ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। যাঁদেরকে এই ধর্মদেশন প্রদান করেন তাঁরা পঞ্চবর্গীয় শিষ্য নামে পরিচিত। তাঁরা হলেন: কৌণ্ডিণ্য, বপ্প, ভদ্রীয় (ভদ্দিয়), মহানামী অশ্বজিত ।

২. উপসম্পদা: বৌদ্ধধর্মে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাকে খুবই পূণ্যকর্ম বলে অভিহিত করা হয়। প্রব্রজ্যা হলো বৌদ্ধশাসনের প্রবেশদ্বার। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর ভিক্ষুত্বপদ গ্রহণে ইচ্ছুক ভিক্ষুর জন্য উপসম্পদা অনুষ্ঠান করা হয়। সংসারধর্ম ত্যাগ করে শ্রামণধর্ম অতঃপর ভিক্ষুধর্মে প্রবেশের জন্য যে বিনয়সম্মত অনুষ্ঠান তারই নাম উপসম্পদা। উপসম্পদা প্রাপ্ত ভিক্ষু সকলপ্রকার বৌদ্ধধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এই উপসম্পদা প্রাপ্ত ভিক্ষু সম্পর্কে আরও দেখা যায়, 'Upasampada is the fullest promising admission to the Previleges of the Buddhist Priesthood' (Robert, 1977, p. 532.)। উপসম্পদা পুত-পবিত্র কর্ম। গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের কালে উপসম্পদা লাভ করেন। অন্যের প্রদত্ত উপসম্পদা বুদ্ধের ছিল না (প্রজ্ঞালোক, ১৯৮৭, পৃপৃ. ৮২–৮৩)। 'উপসম্পদা' বলতে অর্জন ও গ্রহণকে বোঝায়। বিশেষার্থে বৌদ্ধধর্মে সন্ন্যাসজীবনে ভিক্ষুপদ গ্রহণ করাকেই বোঝায়। উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে সকল প্রকার অকুশলকর্ম বর্জন এবং কুশলকর্ম সম্পাদন করতে হয় (রণব্রত, ১৯৮৮, পৃ. ১২৩)। উপসম্পদা অনুষ্ঠান পরিচালনার জন কমপক্ষে চারজন ভিক্ষুর উপস্থিতি থাকা আবশ্যক। যে জায়গায় উপসম্পদা অনুষ্ঠানটি সম্পাদিত হয় সেটি 'সীমাঘর' নামে পরিচিত। সীমাঘর সাধারণত দুই প্রকারের হয়। যথা: ক. বুদ্ধসীমা এবং খ. উদকসীমা (বংশদ্বীপ, ১৯২৯, পৃ. ৪)। বিহারের কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পাথরের ১৬টি ছোটো ছোটো পিলার দিয়ে তৈরি করা হয় 'বুদ্ধসীমা'। আর জোয়ার ভাটা আছে এমন নদী বা খালে পাশাপাশি

দুটো নৌকা বা সাম্পান বেঁধে সাময়িকভাবে তৈরি করা হয় উপসম্পদা প্রদানের অস্থায়ী উদক সীমা (Barua, 1964, p. 36)। বলা বাহুল্য যে, যে বিহারে বুদ্ধসীমা ঘর নেই সেই বিহারের উপসম্পদা অনুষ্ঠান উদকসীমায় করা হয়।

৩. অর্হৎ: যিনি গৌতম বুদ্ধ প্রদর্শিত চারি আর্যসত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে কাম. ভব ও অবিদ্যা আস্রব ক্ষয় করবেন তিনি অর্হৎ। অর্হৎ একটি অর্থবোধক শব্দ যেটি 'অরি' ও 'হত' শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। এখানে 'অরি' মানে শত্রু। আর 'হত' হত্যা করা। সাধারণ অর্থে যিনি ছয় প্রকার কাম রিপুকে (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ [আনন্দ, উন্মাদ, মত্ততা, উল্লাস] ও কৃপণতা) দমন করেন তিনিই অর্হৎ। *'পালি বাংলা অভিধান'* গ্রন্থে অর্হত-এর অর্থ করা হয়েছে, 'যিনি লোভ, দ্বেষ ও মোহরূপ ত্রিবিধ শত্রুকে দমন করে সম্পূর্ণরূপে অলোভ, অদ্বেষ এবং অমোহ প্রাপ্ত হয়েছেন তিনিই অর্হৎ। যিনি সকল প্রকার আসক্তি ক্ষয় করেছেন তিনিই অর্হৎ। যিনি পুর্নজন্ম ক্ষয় করেছেন তিনিই অর্হৎ' (শান্তরক্ষিত, ২০০১, পৃ. ২১১)। *'ধর্মপদ'* গ্রন্থের অর্হৎ বর্গ-এ এ বিষয়ে দেখা যায়, সর্বপ্রকারে বিমুক্ত হয়ে যাঁর সকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন হয়েছে, যাঁর পাপসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, যিনি স্তম্ভের ন্যায় দৃঢ়, সরোবরের ন্যায় অনাবিল তাঁর জন্মান্তর হয় না-তিনি অর্হৎ (রণব্রত, ১৯৮৮, পৃপৃ. ৬১–৬৮)। তৃষ্ণা ক্ষয় হওয়ায় তিনি অর্হৎত্ব লাভ করেন (শান্তরক্ষিত, ২০০১, পৃ. ২২৪)।

৪. মৈত্রী: বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনে মৈত্রী খুবই অর্থবহ। যাপিতজীবনে সতত সুন্দর সমাজগঠনেও মৈত্রীর রয়েছে বেশ প্রভাব। বুদ্ধ ব্রক্ষবিহারের কথা বলেছেন। অর্থাৎ, চার প্রকার মানবিক গুণের (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপক্ষো।) কথা বলেছেন। যেখানে মৈত্রী প্রথম। 'মৈত্রী' শব্দের পালিরূপ 'মেত্তা'। এখানে মৈত্রীর প্রকৃত প্রতিশব্দগুলো হলো 'বন্ধুত্ব', 'শুভেচ্ছা', 'অনুকম্পা', 'স্নেহ-প্রীতি', 'সদাশয়তা, 'সহানুভূতি', 'হিতাকাঙ্ক্ষা' 'পরোপকারিতা' 'সৌহার্দ্য', 'হিতচিন্তা' ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ (Davids & stede, 2003, p. 540)। মৈত্রী পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধিসহ পরিবার,সমাজ, অহিংসও মানবিক রাষ্ট্রগঠনে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করে। মৈত্রীযুক্ত স্থির চিত্ত সৌহার্দ্যময় ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধকরণে বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে *'মধ্যম নিকায়'* গ্রন্থে কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কষভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষ বলে যে যাই বলুক, তাতে উত্তেজিত না হয়ে পাপবাক্য উচ্চারণ না করে সকলের জন্য হিতকামী হয়ে মৈত্রীচিত্তে অবস্থান করার কথা উল্লেখ রয়েছে (বেণীমাধব, ১৯৪০, পৃ. ১৪০)। হিংসামুখর পৃথিবীতে বুদ্ধেও মৈত্রীকে সামনে রেখে অহিংস ও মানবিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ করা যায়। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেন:

> ‘অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে
> জিনে কদরিয দানেন সচ্চেন আলিকবাদিনং’ (রণব্রত, ১৯৮৮, পৃ. ১৪২)।

অর্থাৎ, মৈত্রীর মাধ্যমে হিংসা, দ্বেষ বা ক্রোধকে জয় করবে। সাধুতার মাধ্যমে অসাধুতাকে জয় করবে। দানের মাধ্যমে কৃপণতাকে জয় করবে। সত্য দ্বারা অসত্যকে জয় করবে।

বুদ্ধ আরও বলেন, ‘শত্রুতার দ্বারা কখনো শত্রুতার উপশম হয় না। বরঞ্চ মিত্রতার দ্বারা শত্রুতার উপশম হয়’ (বিনয়েন্দ্রনাথ, ১৯৯৩, পৃ. ১২৮; রণব্রত, ১৯৮৮, পৃ. ৪)। ক্রোধ, হিংসা বা বিদ্বেষ দিয়ে কখনো কাউকে দমন করা যায় না বা দমন করতে পারে না। মৈত্রীযুক্ত ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমে অপরকে খুব সহজেই জয় লাভ করা যায়। সুতরাং কাউকে কায়-বাক্য-মনে আঘাত না দিয়ে মৈত্রী দিয়ে জয় করা আবশ্যক। মৈত্রী প্রদর্শনপূর্বক সীমাহীন ধৈর্য আর সহ্যগুণের মাধ্যমেই অর্জিত হয় প্রকৃত জয়। এটাই হলো মহামতি বুদ্ধের শিক্ষা। সমাজজীবনে বুদ্ধ প্রদর্শিত মৈত্রী চর্চায় জীবন হয়ে উঠবে সুন্দর ও পুত-পবিত্র। সমাজ হয়ে উঠবে মানবিক। শান্তির বাতাবরণে আবদ্ধ হতে পারে পরস্পর। পৃথিবীর সর্বত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে শান্তি। শান্তি, সম্প্রীতি এবং সদ্ভাব বৃদ্ধির অন্যতম গুণ বলা হয় মৈত্রীকে। তাই বুদ্ধ মৈত্রীযুক্ত চিত্তে মায়ের মতো সবাইকে ভালোবাসতে বলেছেন (সাধনানন্দ, ২০০৭, পৃ. ৩৭)।

সহায়কপঞ্জি

আশা দাস। (২০০১)। *ভারত-ভারতবোধ ভারত সংস্কৃতি*। কলিকাতা।

ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, সুমন, স্থবির ভদন্ত ও অন্যান্য। (২০১৫)। *অঙ্গুত্তর নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড। বনভন্তে প্রকাশনী, রাঙ্গামাটি।

ঈশানচন্দ্র ঘোষ। (বা. ১৩৮৪)। *জাতক*, দ্বিতীয় খণ্ড। করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা।

ঈশানচন্দ্র ঘোষ। (বা. ১৩৯১)। *জাতক*, তৃতীয় খণ্ড। কলিকাতা: করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা।

করুণানন্দ ভিক্ষু। (১৯৯৪)। *পালি সাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন*, প্রথম সংস্করণ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

জ্যোতিপাল ভিক্ষু। (২০১৩)। *উদান* দ্বিতীয় সংস্করণ। বাংলদেশ।

ধর্মাধার মহাস্থবির। (১৯৮৭)। *মিলিন্দ প্রশ্ন*। ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা।

ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, রাজগুরু শ্রীমৎ। (১৯৫৪)। *মহাপরিনিব্বাণং সুত্তং*। চট্টগ্রাম।

প্রজ্ঞানন্দ স্থবির। (১৯৩৭)। *মহাবর্গ*। যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড, কলিকাতা।

প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির। (১৯৮৭)। *ভিক্খু পাতিমোক্খ।* কলিকাতা।

বংশদ্বীপ মহাস্থবির। (১৯২৯)। *কর্মবাচা সূত্র*। কলিকাতা।

বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী (১৯৯৩)। *মজ্ঝিম নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড। ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা।

বেণীমাধব বড়ুয়া (১৯৪০)। *মধ্যম নিকায়*, প্রথম খণ্ড। যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড, কলিকাতা।

মণিকুন্তলা হালদার দে। (২০১০)। *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস*। মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা।

মেত্তাবংশ স্থবির (২০১২)। *ইতিবুত্তক*। সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ, রাঙ্গামাটি।

রণব্রত সেন [সম্পা.] (১৯৮৮)। *ধম্মপদ*। হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (২০১২)। *বুদ্ধদেব*। মাটিগন্ধ, ঢাকা।

শান্তরক্ষিত মহাস্থবির [সম্পা.] (২০০১)। *পালি-বাংলা অভিধান*। প্রথম প্রকাশ, বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।

শামছুর রহমান, গাজী। (১৯৯৪)। *মানবাধিকার ভাষ্য*। বাংলা একাডেমী. ঢাকা।

শীলভদ্র, ভিক্ষু (২০০৭)। *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড। সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকা, রাঙ্গামাটি।

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী। (২০০৯)। *সংযুক্ত নিকায়*, ১ম ও ২য় খণ্ড। রাজবন বিহার, রাঙ্গমাটি।

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী। (২০০২)। *মহাশান্তি মহাপ্রেম*। চট্টগ্রাম।

সত্যপ্রিয় ভদন্ত, মহাথের বিনয়াচার্য। (২০০৩)। *চূল্লবর্গ*। বনভন্তে প্রকাশনী, রাঙ্গামাটি।

সাদি, এস.এম। (২০১০)। *বাঙালির গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা*। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা।

সাধনানন্দ, মহাস্থবির বনভন্তে। (২০০৭)। *সুত্তনিপাত*, তৃতীয় প্রকাশ। করুণাপুর বনবিহার, বান্দরবান।

সুমঙ্গল বড়ুয়া। (২০০৫)। *অঙ্গুত্তর নিকায়*, চতুর্থ খণ্ড। বনভান্তে প্রকাশনী, রাঙ্গামাটি, ভিক্ষু।

Bhagvat, D. M. (1939). *Early Buddhist Jurisprudence*. Oriental Books Agency.

Bhattacharya, B. (2012). *Facts of early Buddhism: A study of fundamental Principles*. Mahabodhi Book Agency.

Childers, R. C. (1977). *A dictionary of the Pali Language*. The Memorial Publication of the Vesāk Pujā.

Davids, T. W. R., & Stede, W. (2003). *Pali-English Dictionary*. Motilal Banarsidass Publishers Private Limited.

Dutta, S. (1924). *Early Buddhist Monasticism*. Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd.

Gnanarama, V. P. (1996). *An Approach to Buddhist Social Philosophy*. Ti-Sarana Buddhist Association.

Goyal, S. R. (1987). *A history of Indian Buddhism*. Kusumajali Prakashan.

Hobson, C. (2015). *The Rise of Democracy: Revolution, war and Transformations in International Politics Since 1776*. Edinburgh University Press Ltd.

Horner, I. B. (2007). *Women under Primitive Buddhism*. Motilal Banarsidass Publishers Private Limited.

Imamura, Y. (1918). *Democracy-According to Buddhist Viewpoint*. The Publishing Bureau of Hongwanji Mission.

Jayaswal, K. P. (1943). *Hindu Polity*. The Bangalore Printing & Publishing Co., Ltd.

Klaydesh, P., Chaimusik, S., & Yaemsoonthorn, P. (2017). Democracy on Buddhistic Approach. *Dhammathas Academic Journal, 17*(2), 137–150. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/87402, Accessed on 27 June 2024.

Lama Dalai. (1999). Buddhism, Asian Values, and Democracy. *Journal of Democracy, 10*(1), 3–7. Retrieved from: https://muse.jhu.edu/pub/1/article/16929, Accessed on 27June 2024

Leidecker, K., & Kirthisinghe, B. P. (1973). *Buddhism in a Democratic World*. Buddhist Publication Society.

Ngourungsi, K. (2017). Democracy and Buddhism. *Parichart Journal, 30*(1), 1–11. Retrieved from https://so05.tcithaijo.org/index.php/parichartjournal/article/view/83349, Accessed on 27 June 2014

R. B. Barua, (1964). The Upasatha Ceremony of Buddhist monk. *The Dacca University Studies, 12*(1), 36.

Subba, D. (2022). Reflection of Democracy in Buddhism. *Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies, 10*(72), 17474–17480. https://doi.org/10.21922/srjis.v10i72.11621, Retrieved from https://oaji.net/articles/2022/1174-1664271134.pdf, Accessed on 27 June 2024. Tripathy, R. S. (1967). *History of Ancient India*. Motilal Banarsidass Publishers Private Limited.